গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে শ্রমজীবী মানুষের শক্তির জোরে। প্রাচীন কাল থেকেই, এই শ্রমজীবী মানুষদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্ম দক্ষতায় ধীরে ধীরে সমাজ, সভ্যতা তথা অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় হয়েছে। কিন্তু এই শ্রমজীবী মানুষরা অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক চক্রান্তের জাঁতাকলে পড়ে বিভ্রান্ত এবং বঞ্চিত হয়েছেন। শ্রমের ন্যায্যমূল্য দাবী করা তাদেরই সাজে, যারা প্রকৃত অর্থেই শ্রম করে। যুগ বদলেছে, আর আজ শ্রমিকরাও শিক্ষিত ও সচেতন। তাই খল রাজনীতিকরা সাবধান...

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ৩, সংখ্যা ১২

মে ২০২২

শ্রমিক সংখ্যা

কলম হাতে

ডাঃ অমিত চৌধুরী, শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী, অপূর্ব চক্রবর্ত্তী, প্রসাদ চৌধুরী, শুভ্র নাগ, গোবিন্দ মোদক, অনাবিল তসনিম, এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

@Pandulipi

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

"দূরের জানালা" থেকে পথ চলা শুরু হয়ে "পায়ে পায়ে" চলতে চলতে আজ আপনাদের প্রিয় 'গুঞ্জন' তৃতীয় বর্ষের শেষ সীমানায় এসে উপস্থিত। বিগত এই তিন বছরে আমরা সাথে পেয়েছি বহু গুনীমানী লেখক ও লেখিকাদের। তবে যে শুধু লেখক আর লেখিকাদের পেয়েছি, এটা বলা অনুচিত হবে। কারণ গুঞ্জনের লেখার সাথে জড়িয়ে আছে প্রিয় পাঠক ও পাঠিকাদের উৎসাহ, যার প্রমাণ হিসাবে বলতে পারি, মাঝেমাঝেই গুঞ্জনের 'পাঠকের দরবার' শীর্ষক পৃষ্ঠায় খুঁজে পাওয়া যায় লেখক ও লেখিকাদের অনুপ্রেরণার রসদ। এই চলার পথে অনেক গুনীজনেদের পেয়েছি, আবার হারিয়েছি গুনী কলমকারদেরও। ওনাদের কলম আর চলবে না। তবে 'গুঞ্জন'-কে ভালবেসে আপন করে উপহার স্বরূপ লেখনীর যে ডালি ওনারা সাজিয়ে দিয়ে গেছেন, তা এক বৃহত্তর প্রাপ্তি হয়ে গচ্ছিত থাকবে 'গুঞ্জন'-এর লেখ্যাগারে।

তবে শুধু লেখার কথা নয়, সাথে বিশিষ্ট চিত্রগ্রাহী ও অঙ্কনশিল্পীদের ক্যামেরা ও তুলির ছোঁয়া গুঞ্জনকে করেছে ভিন্নমাত্রিক। আশা রাখি, আগামী বছরগুলিতেও আমরা এইভাবেই নতুন নতুন ভাবনা ও শিল্পকর্মকে আপনাদের কাছে তুলে ধরতে পারব। গুঞ্জনের আগামী চতুর্থ বর্ষে পাবেন নতুন স্বাদের ছোঁয়া। সাথে থাকুন। ■

বিনীতাঃ রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা), সম্পাদিকা, গুঞ্জন

বিনীতঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

কলম হাতে

পাঠকের দরবার

গুঞ্জন ফেব্রুয়ারি ২০২২ সংখ্যার পাঠ-প্রতিবেদন...

ভারতের মুম্বাই থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মানের মাসিক ই-পত্রিকা গুঞ্জন একটি অসাধারণ পত্রিকা। এই পত্রিকাটি যৌথভাবে সম্পাদনা করেন প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং রাজশ্রী দত্ত।

লিটল ম্যাগাজিন হিসেবে মুদ্রিত মাধ্যমে ১৯৭৭ সালে পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয়। এই পত্রিকাটি সারা বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী নবীন প্রবীণ কবি লেখকদের ধারাবাহিক উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, নিবন্ধের পাশাপাশি শিশু-কিশোরদের লেখা, আঁকা ছবি এমনকি আলোকচিত্র, ভ্রমণ কাহিনী, স্মৃতিকথা, রম্যরচনার মতো নানাবিধ সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে আসছে। এখানে লেখক নয় লেখার মানকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

আজ পত্রিকাটির ফেব্রুয়ারি ২০২২ সংখ্যাটি অনলাইনের মাধ্যমে পেয়ে আমি খুব আপ্লুত। প্রচ্ছদটি অতীব আকর্ষণীয়। আর সাথে আছে নিজস্ব প্রকাশনা এবং ছবিসহ বিবরণ, যা সূচীপত্রে লক্ষ্য করা যায় ‘প্রেম সংখ্যা’র এই পত্রিকাতে। কেবল তাই-ই নয়, এখানে কলকাতা ছাড়াও বাংলাদেশের নতুন বইয়ের বিজ্ঞাপনও আছে। এই ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে আমার গল্পগ্রন্থ ‘একটি লাল কাশবন' এর বিজ্ঞাপনটি। যা একুশে গ্রন্থমেলা ২০২২এ বাংলাদেশ, সিলেটের বুনন প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আছে সুসাহিত্যিক পিনাকি রঞ্জন বিশ্বাসের রম্য রচনার বই ‘রং ডেলিভারি', কলকাতার নতুন বই হাসির রাজা প্রণব কুমার

বসুর রচনাসমগ্র ‘পাঁচফোড়ন।' পাণ্ডুলিপি থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ ‘রহস্যের ৬ অধ্যায়', প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় ও রাজশ্রী দত্তের যৌথ কাব্য সঙ্কলন ‘দুই প্রজন্মের কাব্যডালি।' শরণ্যা মুখোপাধ্যায় ও রাজশ্রী দত্ত সম্পাদিত ‘ভূ ভূ ভূ ভূ ভূউত।'

১২ বছরের শিশু রিত্বিকার আঁকা ‘বাংলার নারী' শীর্ষক চিত্রটি সত্যি দুর্দান্ত। সম্পাদক প্রশান্তবাবুর ‘হারিয়ে যাচ্ছে কাঠবিড়ালি' শীর্ষক আলোকচিত্রটি প্রশংসনীয়। তাঁর লেখা একটি তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ ‘ব্যাটারি-বিহীন যুগের পানে' যা ভালো লাগবেই যে কোনো পাঠকের কাছে। রাজশ্রী দত্তের ‘মাঝিরা চলেছে...' শীর্ষক আলোকচিত্রটি অদ্ভুত সুন্দর একটি চিত্র। এছাড়া লেখা আহ্বান বিষয়ক বিজ্ঞাপন আছে, যাতে করে পরবর্তী সংখ্যার বিষয়ে ভাবতে না হয়। আরও আছে ইতিপূর্বে প্রকাশিত সকল পত্রিকার লিংক। যাতে করে খুব সহজেই আগের লেখাগুলোও পড়া যায়।

পরিশেষে, ‘সবিনয় নিবেদন' শীর্ষক আলোচনায় জানতে চাওয়া হয়েছে পাঠকের মতামত এবং একই সাথে আহ্বানও আছে লেখা দেবার। সব মিলিয়ে প্রতিবারের মতো এবারের সংখ্যাটি চমৎকার সব আয়োজনে সমৃদ্ধ হয়েছে, মুগ্ধ করেছে আমাকে। নিঃসন্দেহে যে কোনো পাঠককেই মুগ্ধ করবে।

আমার বিশ্বাস, যে কোনো পাঠকের কাছেই ভালো লাগবে, আমার মতো কিংবা তারও অধিক পরিমাণে। ভালোবাসা ও শুভ কামনায় সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলুক ‘গুঞ্জন’, এই শুভ কামনা রইলো নিরন্তর।

পরিশেষে আমি বলছি, পড়ুন, শেয়ার করুন এবং লিখিয়ে বন্ধুদের পড়তে আহ্বান জানান।

নাহার আলম, সাহিত্যিক, বাংলাদেশ

তোমার সামনে দাঁড়াই

অপূর্ব কুমার **চক্রবর্ত্তী**

যদিও বয়সে একটু হয়েছ অবশ
তবু, শুভ জন্মদিন ও মে-দিবস।

হাততালিতে নিশ্চয়ই কেটেছ কেক
যতটুকু দেখা যায় সেটা তো অর্ধেক
বাকি আধখানা এখনও আছে মিছিলে
ইতিহাস জানে সেদিন তুমি কী ছিলে?

আশা রাখে, চকচকে যত মিথ্যে কথা
ধুয়ে যাবে, তবু মন ভালো নেই, অযথা?
লন্ঠনে আগুন কবে যেন বন্দী হয়েছে
যেহেতু ওটা আলো তাই আশা আছে।

প্রশ্ন ঠুকছে প্রতিদিন ঠুক ঠুক
বিদ্রোহের মুখে গুঁজে এই বিস্কুট
কে দিয়েছিল? বুদ্ধি না পুঁজি?
এসো দিশা, এবার উত্তরটা খুঁজি। ■

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ বেতাব উপত্যকা, পহেলগাম

শিল্পীঃ সুমন চৌধুরী

সবাই জানাবেন এই চিত্রগ্রাহকের তোলা ছবিটি কেমন লাগল...

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ষষ্ঠ পর্যায় (৩)

ডাঃ অমিত চৌধুরী

আজ ২৪শে এপ্রিল। ভোর পাঁচটার সময় বেরিয়ে পড়েছি। তখনো ভালো করে আলো ফোটেনি। যেহেতু আমাদের পরিক্রমা অল্প দিনের জন্য, তাই যত তাড়াতাড়ি যতটা এগিয়ে যাওয়া যায়... নদীর পার ধরেই হেঁটে চলেছি। কখনো বালি, কখনো মাটি... কিছু দূর যাওয়ার পর একটি বসতি দেখলাম। গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করাতে ওরা কি যে বলল কিছুই বুঝতে পারলাম না। তাই আর বোঝার চেষ্টা না করে এগিয়ে চললাম। হেঁটে চলেছি নদীর পার ধরেই। বালির উপর নেমে আসতে হচ্ছে। সূর্যের তাপ ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় বিরামহীন হাঁটা যে কি কষ্টকর যাঁরা ভুক্তভুগী তাঁরা জানেন। বালির উপর একটা কুঁড়ে ঘর দেখলাম। একটি লোক আমাদের ইশারায় কাছে ডেকে চা-খেতে অনুরোধ করল। কিন্তু এই গরমে চা-খাওয়ার ইচ্ছা নেই। তখন মাতাজী সস্নেহে আমাদের দইয়ের শরবত খাওয়ালেন।

দুপুর একটা। প্রায় একটানা আট ঘণ্টা হেঁটে পারের উপর একটি মন্দিরের চূড়া দেখতে পেলাম। বাঁধানো ঘাট তাই সময় নষ্ট না করে স্নান করে গুনে গুনে চল্লিশটা সিঁড়ি

ভেঙে উঠে এলাম চন্দ্রগড় গ্রামে।

এখানে চন্দ্রদেব তপস্যা করেছিলেন। সাধু কুঠির আছে। কয়েকজন পরিক্রমাকারীকেও দেখলাম বিশ্রাম নিচ্ছেন। তাঁদের সাথে আমাদেরও মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যাবস্থা হয়ে গেল। তাঁদের কথানুযায়ী সকাল থেকে প্রায় তেইশ কিলোমিটার হাঁটা হয়ে গেছে। দিব্যানন্দজীর ইচ্ছা ছিল এখানেই রাত্রে থাকি। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা নেই। তাই বিকাল চারটার সময় আবার সূর্যদেবের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

রাস্তা বলে কিছু নেই। নদীর পার ধরে হাঁটা। আজও যে নর্মদা পরিক্রমার রাস্তা এত দূর্গম হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

কখনো নদীর চর ধরে, আবার কিছুক্ষণের মধ্যে পাহাড়ের ফাটলের ভেতরে রাস্তা করে নিয়ে এগিয়ে চলেছি। অন্ধকার হয়ে আসছে। এরই মধ্যে আমরা কয়েকবার আছাড় খেয়েছি। আমাদের এই করুন অবস্থা দেখে একটি মেষ পালক সতপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের একটি সহজ রাস্তা দেখিয়ে দিল। কিন্তু ওমা! এটা কি রাস্তা? পাহাড়ের ফাটল দিয়ে একজন মানুষের চলার মতো পথ। দিব্যানন্দজীকে দেখে বুঝলাম উনি এই রাস্তার সন্ধান জানতেন না। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তাই আর ভাবনা চিন্তার সময় নেই। এরা ভুল পথ দেখাবে না। আমরা চারজন ঢুকে পড়লাম। প্রায় কুড়ি মিনিট কিভাবে যে আমরা হেঁটেছি, তা আমরাই জানি।

নমামি দেবী নর্মদে

তবে হেঁটেছি না বলে, হামাগুঁড়ি দিয়ে চলেছি, সেটা বলাই ভাল। কিছুক্ষণ পর আলো দেখতে পেলাম। বুঝলাম, কষ্টের পথ শেষ। বেরিয়ে এসে পেয়ে গেলাম একটি চওড়া রাস্তা। এটি ভিলারা গ্রাম। এই চওড়া রাস্তার পাশেই একটি আশ্রম। ওই আশ্রমেই আজকে আমরা আসন পাতলাম। কিন্তু মহারাজের মুখ দেখে বুঝতে পারলাম না, উনি আমাদের আসাতে খুশি হলেন না দুঃখ পেলেন! ওনার নির্লিপ্ত মুখ।

"নর্মদে হর"

...ক্রমশ ■

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ
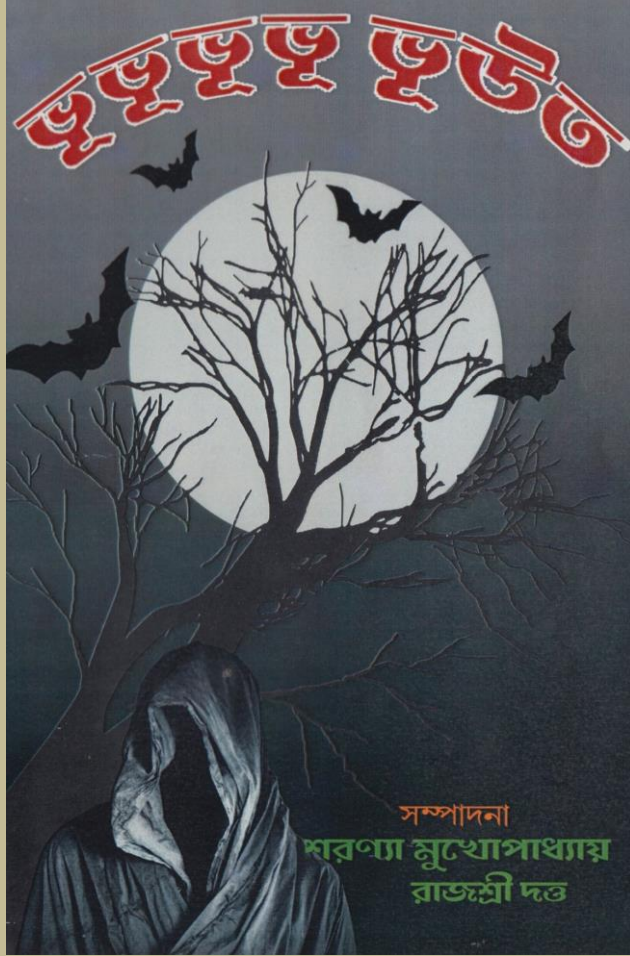
ফেলে আসা স্মৃতির রঙিন পাতা

শুভ্র নাগ

গত ৩০শে এপ্রিল ২০২২ (শনিবার) সন্ধ্যেবেলায় বাড়ির কিছু অত্যাবশ্যকীয় জিনিস কিনতে বেরিয়েছিলাম কিন্ত বাড়ি থেকে একশো মিটারও যাইনি, পড়লাম কালবৈশাখীর কবলে। আর সেই ঝড়বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এক পুরোনো স্মৃতি মনের মধ্যে জেগে উঠল। বাড়ি ফিরে লিখে ফেললাম...

সাল ১৯৭৪। সাঁত্রাগাছি কেদারনাথ ইনস্টিটিউশনের একতলার শেষপ্রান্তের ঘর। জানলা দিয়ে দেখা যায় হরিণঘাটার দুধের ডিপো, অনুজপ্রতিম অমিতদের (ডঃ অমিত ব্যানার্জি, সাঁত্রাগাছি) বাড়িটা। মাসটা ইংরেজী ক্যালেন্ডারের এপ্রিল বা মে – সেটা মনে না থাকলেও মাসটা যে বৈশাখ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কি গরম – পারা যাচ্ছে না। সময় সকাল এগারোটা। ফার্স্ট পিরিয়ড, ইলেভেন সায়েন্সের জনা তিরিশ ছেলের কলকলানিতে ক্লাসের মধ্যে কোনো কারোর কথা শোনা দায়। এমন সময় তিনি এলেন। প্রথাগত চক ডাস্টার আর রোল কলের খাতা হাতে। ফার্স্ট পিরিয়ড হলে তিনি রোল কল করতেন বটে, তবে ব্ল্যাক বোর্ডে চক

ডাস্টার ব্যবহার করেছেন কদাচিৎ। তিনি এলেন মাঝারি উচ্চতার মধ্যবয়সী মানুষ। পরনে ধুতি পাঞ্জাবী, চোখে চশমা, মাথায় মস্তবড় টাক, ভারী শরীর, কথায় ওপার বাংলার টান এবং সদাহাস্যময়। তিনি ক্লাসে ঢোকা মাত্র পিনড্রপ স্তব্ধতা। না ভয়ে নয়, শ্রদ্ধায়। সুদূর উত্তর কলকাতা থেকে প্রচন্ড গরমে আসার জন্যে পাঞ্জাবীটা তখনও ঘামে ভেজা। ক্লাসে এসেই জলদগম্ভীর স্বরে শুরু করলেন পড়াতে – না বিজ্ঞানের কোনো বিষয় নিয়ে নয়, শুরু করলেন বাংলার ক্লাস। তিনি কবিতা পড়াবেন।

৺শ্রী তারা কুমার গুহ

প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মহাশয়

সাঁত্রাগাছি কেদারনাথ ইনস্টিটিউশন, হাওড়া, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত

কি কবিতা? মোহিতলাল মজুমদারের "কালবৈশাখী।" তিনি শুরু করলেন, "মধ্যদিনের রক্তনয়ন অন্ধ করিল কে?" জনা তিরিশ কিশোর মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে তাঁর প্রতিটি কথা – কি অপূর্ব ব্যাখ্যা। কবিতার পরতে পরতে জড়িয়ে

থাকা কালবৈশাখীর রুদ্ররূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে প্রতিটি ছাত্রের চোখের সামনে। তারপর সেই রুদ্ররূপের ভেতর থেকে বার করে আনলেন কালবৈশাখীর সৃজনী রূপ। তাঁর কণ্ঠে প্রাণ পেল মোহিতলাল মজুমদারের এই লাইনগুলি—

“চৈত্রের চিতাভস্ম উড়ায়ে জুড়াইয়া জ্বালা পৃথ্বীর,
তৃণ-অঙ্কুরে সঞ্চারি রস, মধু ভরি বুকে মৃত্তির,
সে আসিছে আজ কাল-বৈশাখে
শুনি টংকার তাহার পিনাকে
চমকিয়া উঠি, তবু জয় জয় তার সেই শুভ কীর্তির।

এত যে ভীষণ, তবু তারে হেরি ধরায় ধরে না হর্ষ
ওরি মাঝে আছে কাল-পুরুষের সুগভীর পরামর্শ।
নীল-অঞ্জন-গিরি-নিভ কায়া,
নিশীথ নীরব ঘনঘোর ছায়া
ওরি মাঝে আছে নববিধানের আশ্বাস দুর্ধর্ষ।”

কবিতা শেষ হলো — পড়ানো শেষ হলো না। তিনি যেন কোনো কলেজে বাংলা অনার্স বা ইউনিভার্সিটিতে বাংলা কবিতা পড়াচ্ছেন।

কবিতার ছত্রে ছত্রে থাকা কথাগুলিকে বোঝাচ্ছেন। কবিতার ছন্দটিকে বোঝাচ্ছেন। তুলনা করছেন সমগোত্রীয় ছন্দের সঙ্গে। পুত্রসম প্রিয় ছাত্রদের নিয়ে চলেছেন এক অনিন্দ্যসুন্দর জগতে। মোহিতলালকে মিলিয়ে দিচ্ছেন

নজরুলের সঙ্গে যেখানে তিনি বলছেন —

"তোরা সব জয়ধ্বনি কর
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়
তোরা সব জয়ধ্বনি কর"

কি সহজে তিনি পরিভ্রমণ করছেন এক কবি থেকে অন্য কবিতে – এবার বঙ্গসাহিত্য থেকে ইংরেজী সাহিত্যে কালবৈশাখীর আগমনকে মিলিয়ে দিলেন Percy Bysshe Shelley -র "Ode to the West Wind" -এর সঙ্গে - যেখানে তিনি বলছেন — "If Winter comes, can Spring be far behind ?"

ঘন্টা পড়ে গেছে অনেকক্ষণ — না শিক্ষক না ছাত্র — কারোর কানেই আসেনি তার আওয়াজ। তিনি যে সবাইকে নিয়ে গেছেন অন্য এক জগতে। তাঁর অসাধারণ বাগ্মীতার জারকরসে জারিত হচ্ছেন মোহিতলাল থেকে নজরুল, নজরুল থেকে শেলী — এ এক অনন্য সাধারণ অভিজ্ঞতা। সেদিনের অপরিণত কিশোর মন কিছু বুঝেছিল কিছু বোঝেনি। এদিকে সেকেন্ড পিরিয়ডের শিক্ষক মহাশয় ক্লাসের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, তিনিও মোহাবিষ্ট। ক্লাস শেষ হল। শুরু হল সেকেন্ড পিরিয়ড - বিজ্ঞানের।

বিকেল সাড়ে তিনটে হবে। আকাশ জুড়ে কালো মেঘ-বাজবিজুলির হানা। ভীষণ ঝড়, বাঁধভাঙা বৃষ্টি। কবিতার

সুখস্মৃতি

পাতার কালবৈশাখী নেমে এলো প্রকৃতির বুকে।

ওই বছরের প্রথম কালবৈশাখী। সকালে এরই তো নান্দীপাঠ করলেন তিনি — কি অদ্ভুত সমাপতন। ঐ দিনের ক্লাসের এক কিশোরের কানে আজও যেন বাজে সেদিনের প্রতিটি কথা। কিছু ভুলে গেলেও কিছু বুঝি মনে স্থায়ীভাবে অন্তর্লিখিত। কেননা, ঐ ক্লাসের দিন কয়েক পরে, সেই কিশোর একদিন তাঁকে "কালবৈশাখী" কবিতাটি আবৃত্তি করে শুনিয়েছিল। আর তিনি উজাড় করে দিয়েছিলেন তাঁর অপরিসীম স্নেহাশীর্বাদ।

আজ এই বছরের প্রথম কালবৈশাখীর দিনে ধুলোঝড়ে মাখামাখি হতে হতে, আর তারপরেই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বাড়িতে ফেরার সময় ভীষণ ভাবে মনে পড়ছিল তাঁর কথা — তাঁর, সেদিনের ক্লাসের কথা।

আজ তিনি অমৃতলোকে। কিন্তু এই লোকেও, আজও তিনি বর্তমান সাঁত্রাগাছি কেদারনাথ ইনস্টিটিউশনের ওনার সময়ের প্রতিটি ছাত্রের হৃদয়ে।

ভাল থাকবেন স্যার। ■

আমাদের সবার জীবনেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই আমরা 'গুঞ্জন'-এ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের ওপর তাঁদের গুণমুগ্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি-সূচক নিবন্ধ প্রকাশ করতে চাই। যাঁর সম্বন্ধে লেখা হচ্ছে এবং যিনি লিখছেন, উভয়েরই ফটো চাই।

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ গ্রাম্য গৃহ সমূহ...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১২ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

রুমাল

(প্রথম পর্ব)

অনাবিল তসনিম (বাংলাদেশ)

কিছু কিছু মানুষ আছে, যাদের কথা শুনলেই মানুষ রেগে যায়। তাদের বিষয়ে ভালো কথা বললেও রেগে যায়, খারাপ কথা বললেও রেগে যায়। আনিস রহমান সেরকমই একজন মানুষ। তার কথা শুনলে কেন মানুষ রেগে যায়, তার কারণ সে অনেকবার উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছে। তাতে কোনো লাভ হয়নি।

তবে একটা ব্যাপার সে খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করেছে — শুধু তার পরিচিত মানুষরাই তার কথা শুনে বিরক্ত হয়। অবশ্য, অপরিচিত কোনো মানুষের সাথে সে তেমন কথাও বলে না। তার একটি ক্ষীণ সন্দেহ — সে লেখালেখি করে, সেই কারণেই তাকে সবাই ঈর্ষা করে। আর ঈর্ষা করে বলেই হয়তো তার কথা শুনে সবাই বিরক্ত হয়। কিংবা আসলে বিরক্ত না হলেও ভাব দেখায় যে সে খুব বিরক্ত।

আনিস রহমান লেখালেখি করে। 'দৈনিক ভোরের কাগজে' নিয়মিত তার কবিতা ছাপা হয়। আনিস রহমান তার লেখক নাম। প্রকৃত নাম মোজাম্মেল সোহেল।

প্রাপ্তি

তার পরিচিত মানুষরাই শুধু তার সব কথায় রেগে যায়, নাকি অন্য অপরিচিত মানুষরাও রেগে যায়, সেটা একবার পরীক্ষা করা দরকার। এর জন্য তাকে এমন একটা জায়গায় যেতে হবে, যেখানে তাকে কেউ চেনে না। তাই সে পরিকল্পনা করলো, আগামী শুক্রবার সে অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বের হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হল। আনিস বেরোলো অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে।

গ্রামের নাম মোহনগঞ্জ। চারপাশ সবুজে ঘেরা। প্রচুর গাছপালা রয়েছে। চমৎকার পরিবেশ। মুহূর্তেই মন ভালো হয়ে যায়। সেখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল।

দূরে একটি নৌকা দেখা যাচ্ছে। নৌকার মাঝি মাথায় হাত দিয়ে নদীর পাড়ে বসে আছেন। সম্ভবত তিনি এখনো কোনো যাত্রী পাননি। তাই হয়তো এভাবে বসে আছেন।

এখনো পুরোপুরিভাবে সন্ধ্যা নামেনি। তাই এখন নৌকা দিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে চারপাশের প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করা যেতে পারে। এমন অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ আর পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ আছে। তাই এই সুযোগটি হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

আনিস মাঝিকে বলল, 'মাঝি ভাই, নৌকা দিয়ে আমাকে একটু গ্রামটা ঘুরিয়ে দেখাবেন?'

মাঝি মাথা তুলে আনিসকে দেখে বলল, 'আপনে কেডা?'

আনিস বলল, 'আমার নাম আনিস। এই গ্রামে নতুন এসেছি।

আমাকে একটু নৌকা দিয়ে গ্রামটা ঘুরিয়ে দেখান।'

মাঝি বলল, 'আইচ্ছা চলেন। নৌকায় বসেন।'

নৌকা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা ছয়টা বেজে গেল। মাঝি বলল, 'সাব, আর কত ঘুরবেন? অহন তো রাইত হইয়্যা যাইতাছে।'

আনিস বলল, আপনি নৌকা ভেড়ানোর ব্যবস্থা করুন।

আনিস নৌকা থেকে নেমে কিছুদূর যেতেই তার চোখ পড়ল একটা হাইস্কুলের দিকে। স্কুলের ওপরে লেখা — 'মোহনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়।' সম্ভবত বেশ পুরোনো আমলের স্কুল। স্কুলটি দোতলা। স্কুলটির সামনে একটি খোলা মাঠ আছে।

আনিস তার সাথে আনা ব্যাগ থেকে একটা বিস্কুটের প্যাকেট বের করল। বিস্কুট খেল। সারাদিন তেমন কিছুই খাওয়া হয়নি। বিস্কুটটা খেয়ে কিছুটা হলেও ক্ষুধা নিবারণ করা গেলো। আনিস স্কুলটির সিঁড়ির নীচে একটা চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। আজকের রাতটা এখানেই কাটাতে হবে। কালকে সকালে উঠে না হয় কোনো আশ্রয় খোঁজা যাবে।

'এই মিয়া, উঠেন! উঠেন কইতাছি।' জনৈক এক ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

আনিস সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্নের মধ্যে কেউ ডাকাডাকি করলে স্বপ্ন ভেঙে যায়। কিন্তু আনিসের ঘুম ভাঙছে না। সে ঘুমের মধ্যেই আবছা আবছা টের পাচ্ছে যে — কেউ তাকে ডাকছে। আনিস সেই ডাককে পাত্তা দিচ্ছে না।

প্রাপ্তি

আবারো শোনা গেলো, 'এই মিয়া, উঠেন না ক্যান? উঠেন কইতাছি।'

আনিসের ঘুম ভাঙল। সে বিরক্তি সহকারে ঘুম থেকে উঠল। ঘুম ভাঙার পর সে চোখ কচলাতে কচলাতে দেখল — নীল শার্ট আর কালো প্যান্ট পরা একজন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখ-মুখ কঠিন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি সম্ভবত এই স্কুলের পিয়ন। আনিস উঠে দাঁড়াল।

— 'কতক্ষণ ধইরা আপনারে ডাকতাছি? কানে হুনেন (শোনেন) না নাকি? আপনি এইহানে ঘুমাইছেন ক্যান? এইডা কি ঘুমাইনের জাইগা? যান এইখান থেইক্যা। এইখানে আর এক মুহূর্তও থাকলে কানের নিচে দুইডা মারমু।'

আনিস তার ব্যাগ আর চাদরটা নিয়ে দৌড় দিল। সকালে উঠেই 'মারধর' খাওয়ার কোনো ইচ্ছে তার নেই।

এক দৌড়েই সে স্কুলের পাশের একটি দোকানে গিয়ে হাজির হল। সকালের নাস্তা করার জন্য দোকান থেকে একটা বিস্কুটের প্যাকেট কিনে বিস্কুট খেলো। দোকানির টাকা মিটিয়ে সে আবার ওই স্কুলের মাঠের এক কোণায় শিমুল গাছের নীচে গিয়ে বসল।

মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সে ইংরেজিতে 'The cow' রচনা বলা শুরু করল। 'The cow is a four-footed domestic animal. It's found everywhere.

It is a very useful animal. The cow has four legs, two eyes, two ears and a long tail...'

আনিস বলতেই থাকল। ইতিমধ্যেই সে কয়েকজন শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। আস্তে আস্তে শিক্ষার্থীরা জড়ো হতে থাকে। বেশ কয়েকজন উৎসুক শিক্ষার্থী উদ্ভট কিছু প্রশ্নও করছে। আনিস সেগুলোর জবাব দিচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর ঘণ্টা পড়তেই সবাই ক্লাসে চলে গেলো।

টিফিনের সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎপাতে আর থাকা গেল না। একেকজন ছাত্রীও এসে প্রশ্ন করে— 'এই পাগলা তোর বাড়ি কই?'

আনিস কিছু বলার আগেই স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব আসলেন। তিনি এসেই রাগী গলায় বললেন, এখানে যেন তোকে আর না দেখি। তোর জন্য আমার স্কুলের সব শিক্ষার্থী ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসেছে। সন্ধ্যার আগেই তুই এখান থেকে চলে যাবি। তুই এখনি বিদায় হ। Just get lost! আনিসকে বিদায় করা হল।

নিশুতি রাত। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। জোছনা যেন ঠিকরে পড়ছে। আনিস হাঁটছে। ঠান্ডা বাতাস বইছে। ঝিরিঝিরি বাতাস। যদিও শীত করছে খুব, তবু তার হাঁটতে বেশ লাগছে। তার গায়ে একটি চাদর জড়ান। মখমলের চাদর। এই চাদরটি সে কিনেছিল ঢাকার নিউমার্কেট থেকে।

প্রাপ্তি

বছর তিনেক আগের কথা। এখনো বেশ চকচকে আছে। রঙ ওঠেনি একটুও। চাদরটি সে কিনেছিলো মূলত তার বাবার জন্য। টিউশনের প্রথম সম্মানিটা দিয়ে সে তার বাবার জন্য চাদরটি কিনেছিল। অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বেরুবার আগে সে চাদরটি তার ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়েছে। কখন কোন প্রয়োজনে লাগে, বলা তো যায় না।

একটা নিরাপদ আশ্রয় খোঁজা ছাড়া আপাতত আর কোনো কাজ নেই তার। আনিস হাঁটতে হাঁটতে খড়কুটো ঘেরা এক বাড়ির সামনে উপস্থিত হলো। ছোট্ট বাড়ি। বাড়ির ভেতর থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে বললেন, 'আপনি কে? এখানে কী চান?'

আনিস বলল, 'আমি আনিস। আজকেই এই গ্রামে প্রথম এসেছি। আমি আজকের রাতটা আপনার বাসায় কাটাতে চাই।

ভদ্রলোক বললেন, 'আচ্ছা আসেন।'

আনিস বাড়িতে ঢুকল। বাড়িতে ঘর মাত্র দুটো। একটা শোবার ঘর, আরেকটা রান্না ঘর। ঘরগুলোও খুব ছোট ছোট। ঘরে আসবাবপত্র বলতে তেমন কিছু নেই। শুধু একটা ভাঙা খাট, আর একটা চেয়ার। বাড়িটির দুইদিকে হাওরের পানি। অপরদিকে দশ-বারোটা বাড়ি। ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, 'ভাই! আপনি কি এই গ্রামে ঘুরতে আসছেন?'

— 'জি। ভাই, আপনার নামটা তো জানা হলো না।'

— 'আমার নাম ইয়াকুব আলী।'

কথাবার্তার এই পর্যায়ে চৌদ্দ-পনেরো বছরের একটা ছেলে ঘরে আসল। ইয়াকুব আলী ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'রাতের খাবার নিয়ে আয়।'

ছেলেটা বলল, 'রাতের জন্য বেশি খাবার নাই। অল্প একটু ভাত আর ডাল আছে।'

ইয়াকুব বললেন, 'যেটুকু আছে, সেটুকুই নিয়ে আয়। আমরা তিনজনে আজ ভাগ করে খাব।'

ছেলেটি রান্নাঘরে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরই তিনজনের জন্য খাবার নিয়ে আসল।

ইয়াকুব আলী অপরাধীর মতো গলায় বললেন, 'আমাদের একটাই প্লেট। এক প্লেটেই আমরা বাপ-ছেলে একসঙ্গে ভাত খাই।'

আনিস বলল, সমস্যা নেই। আজকে আমরা তিনজন এই এক প্লেটেই খাব।

ইয়াকুব আলী লজ্জিত ভঙ্গিতে বসে রইলেন। আনিস বলল, 'আপনার স্ত্রীকে তো দেখছি না।'

ইয়াকুব সাহেব দুঃখিত গলায় বললেন, 'আমার স্ত্রী গত হয়েছেন চার বছর আগে। এই বাসায় এখন শুধু আমি আর আমার ছেলে থাকি।'

— 'ও আচ্ছা।'

প্রাপ্তি

ইয়াকুব আলীর ছেলেটিকে আনিস আগে ভালোভাবে লক্ষ্য করেনি। এখন সে ছেলেটিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে। ছেলেটির গাত্রবর্ণ ফর্সা। পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল।

আনিস বললো, 'তোমার নাম কী?'

ছেলেটি বলল, 'কোটিপতি।'

— 'কোন ক্লাসে পড়?'

— 'ক্লাস ফাইভে।'

ইয়াকুব আলী আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'ভাই, আমার ছেলের নাম শুনে কি আপনি অবাক হয়েছেন?'

আনিস খানিকটা বিস্মিত গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

ইয়াকুব আলী গম্ভীর গলায় বললেন, 'এই নাম রাখার পিছনে একটা কারণ আছে।'

— 'কারণটা কী?'

— 'কারণটা হলো, আমি শুনেছি যেসব মানুষদের নাম ব্যতিক্রম হয়, তারা জীবনে বিখ্যাত হয়। তাই আমার ছেলের নাম *কোটিপতি* রেখেছি। ঠিক করেছি না ভাই?'

— 'অবশ্যই ঠিক করেছেন।'

ইয়াকুব আলী হাসিমুখে বললেন, 'আমাদের গ্রামে একটা হাইস্কুল আছে। কালকে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব। সেই স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব ভীষণ ভালো মানুষ।' ...ক্রমশ ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধিনাশ

(দ্বিতীয় পর্ব)

শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী

পরের দিন আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হল। পুলিশকে লাঠি চার্জ করতে হল। চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে কাজ আরম্ভ করলে বেশ কিছু আন্দোলনকারী নদীর পাড়ে শুয়ে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে লাগল আর পুলিশ চ্যাংদোলা করে এক-একটাকে গাড়িতে তুলতে লাগল। দুপুরের দিকে মহিলাসমেত শত শত গ্রামবাসীকে মিছিল করে আসতে দেখা গেল। মিছিলের সম্মুখে মাথায় টুপিধারী এক মহিলাকে দেখা গেল। মিছিল এগিয়ে এসে পুলিশ ব্যারিকেডের সামনে এসে দাঁড়াল। অনির্বান সামনে টুপিধারী মান্যয়ী সেনগুপ্তকে দেখে অবাক হয়ে গেল। গোটা ব্যাপারটা অনির্বানের কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। তাহলে প্রকৃত অর্থে মান্যয়ী সেনগুপ্ত বুদ্ধিজীবী। এবার গবীবের জন্য কতটা ‘সকাতরে নিবেদিত প্রাণ’ পরখ করে দেখা যাক। ব্যারিকেড থেকে বেরিয়ে অনির্বান জিজ্ঞাসা করল, “আপনি এখানে?” উল্টে মান্যয়ী সেনগুপ্ত অনির্বাণকে প্রশ্ন করল, “আপনি কেন এখানে?”

“খুব স্বাভাবিক, আমার কোম্পানি এই গভর্মেন্ট প্রজেক্টটার

বরাত পেয়েছে, আর প্রজেক্টটা আমি তৈরি করেছি, তাই আমি এখানে। খুব স্বাভাবিকভাবে প্রজেক্ট শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাকে কলকাতা থেকে যাওয়া-আসা করতে হবে। আর আপনি কলকাতা থেকে এখানে এসেছেন আন্দোলন করতে, সরকারি কাজের বিরুদ্ধে গ্রামের লোককে ক্ষেপাতে?”

– “Mind your language. জানবেন এটাই আমার কাজ। আপনাদের মত লোকেদের অন্যায় কাজে বাধা দেওয়াটাই আমার কাজ।”

অনির্বান জিজ্ঞাসা করল, “কোথায় অন্যায় দেখলেন আপনি? যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্রিজ নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অনেক সময় বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্রতর স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়, তাই নয় কি? আচ্ছা আপনি কি ডানপন্থী না বামপন্থী বুদ্ধিজীবী?”

– “ঠিক কি বলতে চাইছেন আপনি?”

– “না, ডান আর বামপন্থী দু-ধরণের বুদ্ধিজীবীদের তো দেখলাম। কোনো কোনো দল বা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা কোথাও কোথাও সরকারি কাজে বাধা দিচ্ছেন, কয়েকটি জায়গায় প্রস্তাবিত কল-কারখানা বন্ধ করে দিয়েছেন, আবার কোথাও প্রায় গড়ে উঠা কারখানা বন্ধ করে দিয়েছেন বা ভাংচুর করেছেন। কোনো কোনো দলের শুধু ইউনিয়নবাজি করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে কয়েক হাজার কল-কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল জানেন? চাইলে ডান-বাম দু পক্ষেরই লম্বা

লিস্ট এখনই দিতে পারি। তা আপনি ঠিক কি কারণে এই আন্দোলন করছেন সেটা যদি বলেন।"

মান্যয়ী সেনগুপ্ত চোখ দুটি বড় বড় করে বলল, "সেটা নিশ্চয়ই এই আন্দোলন দেখে আপনার মত বুদ্ধিমান লোক বুঝতে পারছেন। মোট কথা এখানে এই প্রজেক্ট আমরা করতে দেব না।"

অনির্বান বলল, "আপনি সরকারের এই প্রজেক্ট শেষ পর্যন্ত আটকাতে পারবেন? পারবেন না।"

– "নিশ্চয়ই পারব, দরিদ্রদের বঞ্চনার শিকার হতে আমি দেব না। এখানে ব্রিজ হলে কত লোকের রুটি-রুজি বন্ধ হয়ে যাবে সে ধারণা আপনাদের আছে? আর এখানে গাছ কাটলে কতখানি পরিবেশ দূষণ হবে জানেন? শুধু তাই নয়, নদীর পাড় ভাঙলে প্লাবনের সম্ভাবনা বেশি হবে। এইসব ক্ষতিপূরণ কি করে সম্ভব?"

অনির্বান সোজা কথায় বলল, "দেখুন রেলব্রিজ ও ইন্টার লকিং চালু হলে বেশ কিছু স্থানীয় লোকের চাকরি হবে। আর তাছাড়া জায়গাটা গভারমেন্টের, আমরা কাজটা সম্পন্ন করতে এসেছি মাত্র। আপনাকে কথা বলতে হলে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলতে হবে।"

– "কারোর কাছে গিয়ে আমি কথা বলি না, আমাদের লাগাতর আন্দোলন চলবে। প্রশাসনকে এখানে এসে কথা বলতে হবে।"

বাস্তবিক

– "ঠিক আছে আপনার কাজ আপনি করুন, আমাদের কাজ আমরা করি।" বিশাল পুলিশ বাহিনীর কর্ডন ভেদ করে কেউ আর ভিতরে ঢুকতে পারল না। একদিকে কাজ চলতে লাগল আর অন্যদিকে বিক্ষোভ চলতে লাগল। মান্যয়ী সেনগুপ্ত একটা অস্থায়ী মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে লাগল। অনির্বান ভাবে সত্যি কি এই মহিলা কলকাতা থেকে এসে এখানকার গ্রামবাসীদের উপকার করতে এসেছেন, না ওনার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে।

পরের দিন অকুস্থলে এসে অনির্বানের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল। স্বভাবতই রাত্তিরে পুলিশ থাকে না, থাকে কোম্পানির দুজন সিকিউরিটি গার্ড। গভীর রাতে দুজন সিকিউরিটি গার্ডকে দড়ি দিয়ে গ্রামবাসীরা বেঁধে তান্ডব নৃত্য করে চলে গেছে। যে পরীখা খোঁড়া হয়েছিল সেখানে ইট, কাঠ পাথর, মাটি দিয়ে বুজিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। শক্তিশালী ক্রেনের কিছু কিছু অংশ ভাংচুর করা হয়েছে। আর কিছু শাবল, গাঁইতি ও কোদাল চুরি করা হয়েছে। প্রশাসনের কাছে খবর যেতেই পরের দিন বিশাল পুলিশ বাহিনী সেখানে পৌঁছে গেল। গ্রামবাসীরা বেশ কিছুটা দূরে অবস্থান বিক্ষোভ জানাচ্ছিল। পুলিশ রে রে করে তেড়ে গিয়ে ভীষণভাবে লাঠি চার্জ করতে শুরু করল। আগেরবার পুলিশ লাঠি চার্জ সেরকমভাবে করেনি, লাঠি ঘুরিয়ে ছত্রখান করে দিয়েছিল। এবারে সরাসরি পেটাতে শুরু করল । খানিকক্ষণের মধ্যে

বাস্তবিক

জায়গাটা রণক্ষেত্রের আকার নিল। উন্মত্ত জনতাও ইট-পাটকেল ছুঁড়তে আরম্ভ করল। পুলিশের লাঠির ঘায়ে অনেকেই মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল। আর পুলিশ একে একে সবাইকে ভ্যানে তুলতে লাগল। মান্যয়ী সেনগুপ্ত উত্তেজিতভাবে কিছু বলতে এলে পুলিশ তার পায়ে এক ঘা লাঠি চালিয়ে তাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে চলে গেল।

যথারীতি মান্যয়ী সেনগুপ্তসহ অনেক গ্রামবাসীকে কোর্ট জামিন দিল। মান্যয়ী সেনগুপ্ত দলবল নিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে কোর্ট থেকে বেরিয়ে গেল। কিউল নদীর পাড়ে আবার কাজ শুরু হল কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে। আরও অনেক রাইফেলধারী পুলিশকে ঐ স্থানে মোতায়েন করা হল। উক্ত স্থানে ১৪৪ ধারা জারি করা হল। নির্মাণস্থল থেকে অনেক দূরে মঞ্চ সাজিয়ে মান্যয়ী সেনগুপ্ত অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করল। ইতিমধ্যে মান্যয়ী সেনগুপ্ত কোর্টে এই কাজের বিরুদ্ধে Stay order-এর আবেদন করল। শুনানির পর কোর্ট তা reject করল, তাতে মান্যয়ী সেনগুপ্তর রাগ আরও বেড়ে গেল। অনির্বানের সঙ্গে কখনো-সখনো দেখা হলে, সে তির্যকভাবে তাকিয়ে হুমকি দিতে ছাড়ত না। অনির্বান জাস্ট তাকে avoid করতে লাগল। এইভাবে কাজ চলতে লাগল। কখনো-সখনো দুই পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যেত। পুলিশ আবার লাঠি উঁচিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিত। এইভাবে কাজ ও বিক্ষোভের সহাবস্থানে

বাস্তবিক

মাসাধিককাল অতিক্রান্ত হল। নদীর দুপাড়ে গভীর পরীখা খনন করে তার বেস ঢালাই হয়ে গেল। একেবারে ইস্পাতের পিলার স্থাপিত হবে। কিছু ইস্পাত সাইটে পৌঁছে গেল। বাকি প্রয়োজনীয় ইস্পাত ট্রেলারে করে পৌঁছলে তারপর কাজ শুরু হবে – আর তাছাড়া ঢালাই অংশ বেশ কিছুদিন ফেলে রাখতে হয়, তাই অনির্বান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আপাতত কলকাতা ফিরে গেল।

পক্ষাধিক কাল অতিক্রান্ত হবার পর কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর অনির্বাণকে অফিসে জানাল যে অবিলম্বে আমাদের বিহার যেতে হবে। কারণ মান্যয়ী সেনগুপ্তর সঙ্গে আমাদের বসতে হবে। অনির্বান চোখ বড় করতেই ডিরেক্টর বলে উঠলেন, "হ্যাঁ অনির্বান, আমাদের মান্যয়ী সেনগুপ্তর সঙ্গেই বসতে হবে। একটা কিছু সমঝোতার রাস্তায় আমাদের আসতে হবে, নাহলে কাজটা আমরা ঠিকঠাক মত করতে পারব না। প্রশাসন থেকে সেরকম নির্দেশ আমার কাছে এসেছে।"

– "স্যার, ঠিক বুঝলাম না।"

– "না বোঝার কিছু তো নেই। ইতিমধ্যে প্রশাসন মান্যয়ী সেনগুপ্তর সঙ্গে কথা বলেছে। প্রশাসন বলটা আমাদের কোর্টে ঠেলে দিয়েছে। তাদের বক্তব্য মান্যয়ী সেনগুপ্তর সঙ্গে আমরা বসলেই মিটমাটের কিছু একটা রাস্তা বেরিয়ে আসবে। অতএব বুঝতে পারছ, মান্যয়ী সেনগুপ্ত প্রশাসনের কাছে সেরকম কিছু

একটা ইঙ্গিত নিশ্চয়ই দিয়ে থাকতে পারে। আসলে কি জানো অনির্বান, এই যে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আছে না, এরা এখন সমৃদ্ধজীবী সম্প্রদায় হয়ে গেছে। আমরা জানি যে শিশুদের দেহের পরিমাণগত পরিবর্তন অর্থাৎ দেহের আয়তন (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা) ও ওজন বাড়ানোকে বৃদ্ধি বলে। 'Growth is a function of the organism rather than of the environment as such' অর্থাৎ বৃদ্ধি হল দেহ যন্ত্রের ক্রিয়া যা পরিবেশের ক্রিয়া দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হয় না। আর বিকাশ হল ব্যক্তির সেই জাতীয় শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার পরিবর্তন যার দ্বারা ব্যক্তি যে কোনো জাগতিক ক্রিয়া-কলাপকে আরো বেশি দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে। অর্থাৎ বিকাশ হল বিশেষভাবে আকৃতির পরিবর্তন এবং কাজের উন্নতি। অতএব আমাদের সমাজের বুদ্ধিজীবীদের বৃদ্ধি ও বিকাশ কোনটাই নেই। তাদের বৃদ্ধি তাহলে কিসের সেটা খানিকটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ... আমি সেটা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নই। আমি খালি ভাবছি এই কেসটার মধ্যে কিছু একটা lacuna আছে।"

– "স্যার, আপনি এত সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারেন, তাতে যে কেউই আপনার কথায় ইমপ্রেস হয়ে যাবে।"

– "আরে অনির্বান, এই করে তো চুল-দাড়ি পাকিয়ে ফেললাম। ঠিক আছে let us proceed to Bihar. আমি এয়ারের টিকিট কাটিয়ে ফেলছি, মোটামুটি আমরা পরশু যাব, সেইমত রেডি থেকো।

বাস্তবিক

বিহারে পৌঁছাতেই প্রশাসন থেকে গাড়ি করে সোজা Hotel Chanakya (Patna) -তে নিয়ে গেল। বিরাট হোটেল, বিশাল এক স্যুইটে তাদের রাখার ব্যবস্থা হল। অনির্বান বসে্র দিকে তাকাতে বস্ বললেন, "চুপচাপ দেখে যাও, আরও অনেক চমক বাকি আছে। এখানেই মান্যয়ী সেনগুপ্তর সঙ্গে মিটিং হবে। মান্যয়ী সেনগুপ্ত এখানে একা এসে আমাদের সঙ্গে মিটিং করবে। যাও ফ্রেশ হয়ে খেয়ে নাও। কালকে ঠিক সকাল দশটার সময় মিটিং।"

অনির্বান খালি ভাবতে লাগলো "হঠাৎ করে পাটনার হোটেলে মিটিং করার কি দরকার ছিল! আর মিটিং কাজের জায়গায় না করে, হঠাৎ হোটেলে করার কি দরকার ছিল? আর পাটনার হোটেলে করলেও সেখানে প্রশাসনের লোকজন থাকবে না, এই ব্যাপারটার মধ্যে যেন একটা কিরকম রহস্য রহস্য গন্ধ আছে। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়... ...ক্রমশ ■

শ্রমিক ও মে দিবস

গোবিন্দ মোদক

কারখানাতে কাজ করছে শ্রমিক অবহেলে,
রেস্টুরেন্টে ব্যস্ত কাজে কমবয়সী ছেলে।
নরম মনের কিশোরীরা বাবুর বাড়ি খাটে,
ইস্কুলে নয়, কাজটা করে দিনটা তাদের কাটে।

কম মজুরি পেলেও শ্রমিক কাজটা করে যায়,
নইলে বলো দু'মুঠো ভাত কোথা থেকে পায়!
মাথার ঘাম ঝরিয়ে পায়ে খনির শ্রমিক যতো,
দিন-রাত্তির কাজ করে যায় বলদ-গাধার মতো।

খনির শ্রমিক, মাঠের শ্রমিক, শ্রমিক কারখানার,
তাঁরা মালিক, এরা শ্রমিক এটাই শুধু জানার।
তবু এরা জানে না তো মে দিবসের কথা,
পেটে খিদে কাজ করে যায় নিয়ে মনের ব্যথা। ■

গুঞ্জনের কোন কোন লেখা আপনাদের ভাল লেগেছে — সেই সম্পর্কে আপনাদের মন্তব্য আমাদের ই-মেলে (আপনাদের ছবির সাথে) লিখে পাঠান। আপনাদের মূল্যবান মতামত আমরা তুলে ধরতে চাই 'পাঠকের দরবার' বিভাগে।
আমাদের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২১

https://online.fliphtml5.com/osgiu/wlch

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ymfp

https://online.fliphtml5.com/osgiu/kabb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/inhj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/nmnj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ckkh

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tlro

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ehsn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ogbi

https://online.fliphtml5.com/osgiu/zrsw

https://online.fliphtml5.com/osgiu/iirn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/uuyz

পাঠকদের সুবিধার্থে

নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা ‘গুঞ্জন’-এর ২০২১ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।

যুদ্ধ

(১ম পর্ব)

প্রসাদ চৌধুরী

সাতটার আগেই রামদেওকে ছুটতে হবে রেল জংশন-এর সাইডিং-এ। আকাশটা মেঘে ছাওয়া। বুঝবার উপায় নেই কত বেলা হল। কিন্তু লোকো রানিং শেডের 'সাইরেন' তো আছে। মাত্র পলক ব্যবধানে প্রতিদিন পৌনে সাতটায় যথারীতি 'সাইরেন' বাজতে আরম্ভ করে। সকালের বাতাস চিরে 'সাইরেনে'র বাঁশীর শব্দ দমনপুরের 'গরম বস্তিতে'ও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আর তাই রামদেও বোঝে, এইবার সাইডিংমুখো ছুটতেই হবে, বেশি দেরী হয়ে গেলে আধরোজের কাজও হয়ত মিলবে না – সব ফেলে রেখে সে হুড়মুড় করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। আষাঢ় মাস। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

রাস্তাঘাট ভেজা, গরম জঙ্গলের গাছ-গাছালি সব একদিনের বৃষ্টিতে ভেজা। ভিজে জবুথবু হয়ে গেছে কাঁচা রাস্তার পাশে ঘনবদ্ধ যত কুঁড়ে ঘর আছে। এই সময়টাতে সাইডিং-এ সবাইকে একটু সতর্ক থাকতে হয়। চোট জখম যে কোন সময়েই হতে পারে; কিন্ত শীতের সময় এতো ঝুঁকি নেই কাজে।

সংঘাত

দিন কয়েক আগে কাঠের ‘লগ’ রেলের বগিতে ওঠাতে গিয়ে বাঁ হাতখানা মচকে গেছিল। খুব কষ্ট পেয়েছিল সে ওইদিন। চোলাই খেয়ে কতটুকু আর ব্যাথা কমবে? জলে আর ঠাণ্ডায় কনকনিয়ে উঠছিল; বাড়ি ফিরেই সে বিছানা নিল। বউ সাহস করে জিজ্ঞেস করল, ‘একটু গরম তেল মালিশ করে দেব?’

বিছানার উপর ছটফট করতে করতে রামদেও খিঁচেমিচে জবাব দিল, ‘জানি না। কালকে থেকেই দেখা যাবে, কোন শালা খাওয়া দেয় – বুরবাক কাঁহিকা।’

ঠিকই, তার একান্ত অভিপ্রায়গুলি বউ-এর কাছে আর নতুন করে বলার কিছু নেই। তবু বউ একবার না শুধিয়ে সাহস পায় না। একটু তেল গরম করে নেয় বউ তখন। বিহারী স্বামী রামদেও-এর বাঙালী স্ত্রী ‘পান্না।’ তেলের বাটি থেকে উঠে তার শক্ত কাঠির মত আঙ্গুলগুলো ধীরে সুস্থে রামদেও-এর সুঠাম বাহুর উপর ওঠানামা করতে থাকে। রামদেও ক্যাট ক্যাট করে তাকিয়েছিল। ঝর ঝর করে বৃষ্টি পড়ছিল তখনো। ঘরের খুব কাছাকাছি কোথাও সাপের মুখ থেকে একটা ব্যাঙ মাঝে মাঝে অনেক কষ্টে গুঙিয়ে উঠছিল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে শেষে হঠাৎ যেন তার দু-চোখের কোণে কিসের একটা আর্তি জেগে উঠেই পরক্ষণে মিলিয়ে গেল। কুঞ্চন দেখা দিল নাকের খাঁজে। বিদ্রুপ তীক্ষ্ণ স্বরে বলতে লাগল, ‘উহ্ চেহারাখানা কি, মাগী যেন দু’দিন

বাদেই খাটে চড়বে।’ একটু থেমে শোনাল আবার, ‘দেখে আয় গে আর সব মাগীগুলোকে — কেমন তাগড়া তাগড়া কেমন জোয়ান।’

পরের দিন কিন্তু হাত নিয়ে সে আরাম করে বসে থাকতে পারেনি। প্রত্যুষেই বউকে সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল সে বড়ই খেদ করে, ‘বুঝলি তো, আমাদের আর রোগশোক বলে কিছু নেই – একদিনের কাজ না হয় তো একদিনের রুজী বন্ধ, সাফ কথা।’

তাকে যথারীতি কাজে যেতে হয়েছিল। আজও সে প্রতিদিনকার মতো কাজেই যাচ্ছিল; কিন্ত জাতীয় সড়কের ওপর উঠতেই, লাইন হোটেল থেকে কোন পরিচিত ব্যক্তি তার নাম ধরে ডাকল, সেই কণ্ঠস্বরে সে থমকে দাঁড়াল। লাইন হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো রামবাহাদুর। কাঠ চোরা কাটাই-এর সর্দার। রামদেও কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে পড়ল রামবাহাদুরের একটি হাতের কোমল স্পর্শে। এরপর রামবাহাদুর মুখ নীচু করে ফিস্ ফিস্ কথায় যা বলে গেল তার সারমর্ম এই যে, আজ সন্ধ্যা সাতটায় সে গাড়ি নিয়ে আসবে শহরের দু’জন চোরা কাঠ ব্যবসায়ীকে নিয়ে। রামদেওকে প্রস্তুত থাকতে হবে লাইন হোটেলের সামনে। গাড়িতে খয়ের কাঠের ‘লগ’ লোড করার লেবার নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে তাকে। দশজন লেবার লাগবে। ‘রায়ডাক’ থেকে মাল উঠবে ট্রাকে, রাত ১২ টায়। রামদেও

জানে এসব কাজে খুব ঝকমারী। ধরা পড়লে একেবারে থানা-পুলিশ-কোর্ট। কয়েকদিন রুজি বন্ধ। তবুও জঙ্গলে এই বাড়তি কামাই-এর প্রতি লোভ সামলাতে পারে না রামদেও। অবশ্য এইসব কাজে মজাও আছে। কোনো কারণে ট্রাকে মাল বোঝাই না হলে এক ট্রিপ মালের লেবার চার্জ ওরা ঠিক পেয়ে যায়।

রামদেও যথারীতি জংশন স্টেশনের সাইডিং-এ পৌছে গেল; এবং ওয়াগনে কাঠের স্লিপার ওঠানোর কাজে মনযোগ দিল। একসময় টিফিন হয়। রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ হোটেলের একটি থেকে সে ঘুঘনি আর পাঁউরুটি কিনে খেল।

বৃষ্টি একটু ধরে এসেছিল; কিন্ত যতোই বিকেল গড়িয়ে এলো ততোই অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে শুরু করে। সাইডিংটার দূর দক্ষিণে একটা দল তখনো ওয়াগন থেকে পাথর স্তুপ করছে মাটিতে। আর রামদেওদের দলটা মোটা মোটা স্লিপার ঘাড়ে করে নিয়ে ওয়াগনের পাটাতনের উপর জড় করছে।

মাল অফিসটা সামনেই। তার শেডের তলায় দাঁড়িয়ে ঠিকেদার চিংড়ি মাছের মত লাফালাফি করছিল আর কেবলই চেঁচামেচি করে ধমক দিয়ে উঠছিল, ‘সামালকে, সামালকে - হেই বুরবাক।’

এই ঝড়জলের মধ্যেও বেলা পাঁচটার আগে রামদেও সাইডিং থেকে ফিরতে পারেনি। সাইডিং থেকে দ্রুত হেঁটে

আসতে আসতে পঁচিশ মিনিট সময় আরও পেরিয়ে গেল ওর বাড়িতে পৌঁছতে। আসার পথে চোলাই-এর দোকানে একটু থমকে দাঁড়িয়েছিল সে; কিন্ত পকেটে পয়সা নেই একটাও। সপ্তা গেলে পয়সা মিলবে। অন্যদিন সে ঘরে ফেরে আরো ঘণ্টাখানেক লাগিয়ে একবার ঢুঁ মেরে আসতে হয় দমনপুরের পশ্চিম পাড়ার একটি ঘরে। এখানে অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় পাকা চোলাই।

... ক্রমশ ■

সবিনয় নিবেদন

'গুঞ্জন' কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা 'গুঞ্জন'-এ দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের 'ই-মেল'-এ (contactpandulipi@gmail.com) পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু'ট 'ফরম্যাট'-ই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি 'পাসপোর্ট সাইজ'-এর ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর **'পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)'** গোষ্ঠীতে অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: জুন ২০২২ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ই মে, ২০২২

না

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

জানলার সামনে এসে কেশব কান পেতে শুনতে পায় সানাইয়ের সুরে সারা এলাকা যেন গমগম করছে। আর গমগম হবে নাইবা কেন? এ কি আর যে সে বিয়ে। এ তল্লাটের বিধায়ক নবীন মিত্রের মেয়ের বিয়ে। কেশব জানলার দিকে দাঁড়িয়ে থাকলেও দরজার দিকে কান সজাগ করে আছে। অপেক্ষায় আছে এই বুঝি মেয়ে আসবে।

সানাইয়ের সুর শুনতে শুনতে কেশবের মনে এক অন্য সুর বেজে ওঠে। মনে হয় এই তো সেইদিনের কথা। “নবীন মিত্র আমার হাতের কাজ দেখে বলেছিলেন তাঁর মেয়ের বিয়ের সব গয়না আমার মালিক দীপেনদার কাছেই গড়তে দেবেন। কিন্তু সময় ছিল কম তিন দিনের মধ্যে সব তৈরি করে দিতে হত।” তাই নাওয়া খাওয়া ভুলে কেশব নিখুঁত ও অভিনব ডিজাইনের গয়না তৈরি করতে থাকে। দীর্ঘ কুড়ি বছরের জীবনে তার কাজে এক ফোঁটাও ভুল নেই। শেষ ঝালাইটা করতে যাবে, ঠিক সেই সময়ে ভ্যাপসা ঘুপচি ঘরের জানলাটা দমকা হওয়ায় খুলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে জানলার সামনে রাখা অ্যাসিডের বোতলটা উল্টে যায়। আর

প্রতিদান

গয়না বাঁচাতে গিয়ে কয়েক ফোঁটা অ্যাসিডে কেশব তার দৃষ্টি চিরতরে হারিয়ে ফেলে। আজ তার কাছে সমস্ত পৃথিবীটা আঁধারে ঢাকা। কেশবের চোখ বেয়ে নেমে আসে জল।

দরজার খোলার শব্দে কেশব চমকে ওঠে। গলা হাকিয়ে বলে, "কে মানাই এসেছিস। দীপেনদা নিশ্চয় আমার কথা খুব বলছিলেন। আমি আর দীপেনদার জন্য কিছুই করতে পারব না। দীপেনদা নিশ্চয় মাস মাহিনা সহ ওই ওভার টাইমের টাকাটা পাঠিয়েছ্নে? আমি জানি উনি দেবতুল্য মানুষ। আমার কত প্রশংসা করতেন জানিস। যার জন্য আমি অন্য কোথাও আর কাজ করার কথাও ভাবিনি। এই দুর্দিনে উনি দেখবেন।" মানাই নিরুত্তর থাকে। খানিক বাদে ভেজা গলায় বলে "না টাকা দেয়নি। বলেছেন তুমি কাজটা শেষ করতে পারনি। তাই ওনার অনেক ক্ষতি হয়েছে। তাই কোনো টাকাই দেবেন না। অথচ তোমার তৈরি গয়না পরেই নবীনবাবুর মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। আর এদিকে নবীনবাবু যে তোমাকে আড়ালে বলেছিলেন গয়না বাবদ উপরি উপহার দেবেন, তিনিও তা দিতে অস্বীকার করলেন।"

কেশব অসহায়ের মতো হেসে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলে, "কান্না কিসের মানাই? আসলে গরীবের বিশ্বাস ও সৎ পারিশ্রমিকের মূল্য — না।" ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

পথে চলা

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

ঘাটে বাসন মাজতে মাজতে, সুমতির একটা আঙুল কেটে রক্ত ঝরতে লাগল। মালতী আঁচল ছিঁড়ে, সেখানে একটা পট্টি বেঁধে দিয়ে, শুধাল, "খুব জ্বলছে?"

সুমতি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, "আর কি জ্বলবে? গোপাল আজ তার বৌকে নিয়ে কলকাতার বাসায় চলে গেল রে মালতী..."

– তোকে নিয়ে গেল না?

– না। আমি থাকলে নাকি ওরা ইচ্ছামত জীবন কাটাতে পারবে না...

পঁচিশ বছর ধরে মালতী আর সুমতি একই ঘাটে বসে বাসন মাজে। মালতীর মনে পড়ে – মিত্তির বাড়ির অনিমেষদা গোপালকে কোন আবাসিক স্কুলে পাঠিয়ে, সুমতিকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিলেন। তা জেনে, সুমতিকে অনিমেষদার সাথে যাবার পরামর্শই সে দিয়েছিল। কিন্তু সুমতি বলেছিল, "গোপাল মানুষ হোক, এই তো ক'টা বছর, কেটে যাবে..."

বছরগুলো কেটেছে, সুমতির আঙুলগুলো হাজায় ক্ষয়েছে, গোপালও মানুষ হয়েছে। এখন খুব বড় চাকরি করে, কলকাতার

দিশা

বহুতল আবাসনে তার বাস। সেখান থেকে ঘাটে বসে বাসন মাজায় ব্যস্ত যে কোন নারীকেই শুধু মাত্র একটি কালো বিন্দুই মনে হয়।

মালতী সুমতির বাসনগুলোও মেজে, সব বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এল। তারই ফাঁকে, সে মিত্তির ঠাকরুনের থেকে অনিমেষদার ফোন নম্বরটাও জোগাড় করে ফেলল। সে জানত, অনিমেষদা আজও অবিবাহিত।

রাতে, মালতী অনিমেষকে ফোনে সব কথা জানাল। অনিমেষ কথা দিলেন, রবিবার তিনি আসবেন সুমতির সাথে দেখা করতে...

কথাটা শুনে, সুমতি ঝাঁজিয়ে উঠল, "কি করলি রে মুখপুড়ী?" মালতী তার গালে একটা পেঁচানো খিমচি দিয়ে, তাকে থামিয়ে দিল... ■